হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রাঃ) এর অমূল্য

উপদেশাবলী

সালেকের অমূল্য পাথেয়

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

সালেকের অমূল্য পাথেয়

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ)
এর
অমূল্য উপদেশাবলী

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

সালেকের অমূল্য পাথেয়

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ)

সংগ্রহ ঃ প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

প্রকাশনায় ঃ সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

প্রকাশকালঃ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩

মূল্যঃ ৬০.০০ টাকা

Invaluable Advices

By: Hazrat Haji Imdadullah Muhajire Makki (R.A)

Edited by: Professor Dr. Syed Badiuzzaman Faruque

ফরিদ ভাইজানের রূহের মাগফেরাত কামনায়

”হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর
এবং সত্যপন্থীদের সঙ্গে থাকো” (আল কুরআন)।

সূচী

১। ভূমিকা/৭

২। সালেকীনদের স্তর/৯

৩। বায়আত গ্রহণের নিয়ম/১২

৪। চিশ্‌তীয়া তরীকার যিকির/১৪

৫। যিকিরের শুগল ও অজীফা/২১

৫.১ মুরাকাবা পদ্ধতির বর্ণনা/২৫

অমূল্য উপদেশাবলী/৩১

১। ভূমিকা

জেনে রাখ, সালিক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথের যাত্রীকে আল্লাহ্‌র পথে চলার এবং সীরাতে মুস্তাকিম যাত্রার তাওফিক যখন দেয়া হয়, তখন তার অন্তর হেদায়েতের জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠে। গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার দূর হয়ে যায়। (ইয়াহদিল্লাহু লিনুরী মাইয়াশাহ) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার নূর অর্জনের তাওফিক দান করেন। আল্লাহ প্রদত্ত এ নুরের প্রভাবে তাঁর অন্তরে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণের সৃষ্টি হয়। তখন সে নিজকৃত পাপের কথা স্মরণ করে তওবার রজ্জু হাতে নিয়ে গাফুর ও রাহীম এবং সকল প্রয়োজন পূরণের কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ তায়ালার প্রতি রুজু হয়।

এমন সময়ে কোন একজন কামেল মুরশিদ ও শায়েখের দরবারের আশ্রয় ব্যতিত পূর্ণ সফলতা লাভ করা যায় না। সুতরাং তাঁর জন্য এমন সময় শরীয়ত ও তরীকত উভয় বিষয়ে অভিজ্ঞ মুরশিদের গোলামীর গৌরব অর্জন করা উচিত। ফলে সে শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও কুপ্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের তাড়না থেকে রক্ষা পেয়ে যেতে পারে। বাতেনী রোগের জন্যে এমন সত্য ও সুক্ষ্মদর্শী চিকিৎসক দ্বারা নির্ণিত ঔষধ পথ্যাদিই তার ব্যরহার করা কর্তব্য। কারণ, বাতেনী রোগ যথা হিংসা, কৃপণতা, অহংকার, বিদ্বেষ, বিয়া ইত্যাদির মূল্যেৎপাটন ব্যতিত জ্ঞান, সহনশীলতা, বদান্যতা,

বিনয়, নিজেকে ছোট মনে করা, কম খাওয়া, কম কথা বলা ইত্যাদি সদগুণ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না আর আল্লাহ্র সানিধ্যও লাভ হবে না যদি না কামেল মুরশিদের বাতানো ঔষধ পথ্যাদি ব্যবহার করা হয়। এজন্যেই কোন মুরশিদে কামেলের দরবারে হাজিরী দেয়া প্রয়োজন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, “হে ঈমানদারেরা, আল্লাহ কে ভয় কর, সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।”অন্যত্র আল্লাহ বলেন, “যারা আমার দিকে রুজু হয়, তাদের পথ অনুসরণ কর।”এই নির্দেশটি অবশ্য পালনীয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা ওয়াজিব। বায়আত হওয়া এবং মুরশিদে কামেলের হস্ত ধারণ করার বিষয়টি রসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ পাক বলেন, “হে নবী, আপনার হাতে যারা বায়আত করে তারা মূলতঃ আল্লাহ্র হাতেই বায়আত করে।”আরো বলেন, “বৃক্ষের নীচে যখন তাঁরা (সাহাবীগণ) আপনার হাতে বায়আত করছিলো।” রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন,“উম্মতের তুলনায় নবীর মর্যাদা যেমন, শায়েখ ও মুরশীদের মর্যাদাও তাঁর সম্প্রদায়ে তেমন।” বুযুর্গদের অভিমত হলো, “যে ব্যক্তি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাহচর্য লাভের আগ্রহ করে, তার সূফী-ওলীআল্লাহ্দের খেদমতে হাযিরী দেওয়া উচিত।” যে ব্যক্তি এমনটি করবে, তার সম্পর্কে দৃঢ় আশা করা যায় যে, অবশ্যই সে স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হবে।

২। সালেকীনদের স্তর

এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে সুলুকের বিভিন্ন তরীকা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হবে। বাতেনী রোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞ চিকিৎসক তথা প্রত্যেক যমানার শায়েখে কামেলগণ স্বতন্ত্র ঔষধের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। এজন্যে সুলুকের মধ্যে অসংখ্য তরীকার সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল তরীকার পর্যালোচনায় তিনটি অভিমত পরস্পর নিকটবর্তী পাওয়া যায়।

(ক) ১ম তরীকা সালেহীন ও শ্রেষ্ঠলোকদেরঃ

এই তরীকায় শরীয়তের সকল ফরজ কাজ যথা-রোজা, নামায, তিলাওয়াতে কুরআন, জিহাদ, হজ্জ ইত্যাদি আদায় করে চলতে হয়। এ পদ্ধতিতে মনযিলে মকসুদে পৌঁছাতে কিছুটা বিলম্ব ঘটে।

(খ) ২য় তরীকা সাধনাকারীদের ঃ

এ তরীকায় চারিত্রিক দোষগুলোকে সদগুণাবলী দ্বারা এবং সকল ধরণের বক্রতাকে সুন্দর নৈতিক গুণাবলী দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। এ পথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলকাম হওয়া যায়।

(গ) ৩য় তরীকা শাত্তারিয়াগণেরঃ

এসকল সালিক জাগতিক আবিলতা হতে নিজেদের সম্পর্কচ্ছেদ করে মানুষের সংসর্গ হতে আলাদা হয়ে থাকেন। প্রেমাস্পদের তীব্র মিলন আগ্রহ এবং যিকর ও শুকুর, স্মরন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

ভিন্ন এদের লক্ষপথে আর কিছু থাকে না। তাদের দৃষ্টিতে কাশফ ও কারামতের কোন গুরুত্ব থাকে না। মৃত্যুও পূর্বেই মরে যাবার অনুশীলনে দৃঢ়তার সাথে তারা সময় ব্যয় করেন। এ তরীকায় প্রথমোক্ত দু তরীকার তুলনায় দ্রুত মূল উদ্দেশ্যে সফলকাম হওয়া যায়। এ তরীকায় সফল হবার জন্যে দশটি উপায় রয়েছে।

(১) তওবা তথা আল্লাহ ব্যতিত আর কিছু মতলুব ও মকছুদ যেন না থাকে।

(২) যুহদ তথা মৃত্যুর সময় যেমন জাগতিক সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তেমন এখানেও যেন দুনিয়া ও এর কোন কিছুর সাথে যেন কোন সম্পর্ক না থাকে।

(৩) তাওয়াক্কুলঃ মৃত্যুর সময় যেমন যাহেরী আসবাব ও জাগতিক উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করতে হয়, তেমনি এ জগতেও যেন এসব কিছু পরিত্যাগ করে কেবল আল্লাহর উপর ভরসা থাকে।

(৪) কানাআতঃ মৃত্যুর সময় যেমন নফসানী কোন খায়েশ, প্রবৃত্তির কোন তাড়না থাকে না, এখানেও যেন না থাকে।

(৫) আযলতঃ মৃত্যুর সময় যেমন মানুষের সঙ্গ লাভের আর কোন সুযোগ থাকে না, তেমনি এখানেও যেন সে মানুষের সংসর্গ হতে দূরে থাকে।

(৬) তাওয়াজ্জুহঃ মৃত্যুর সময় যেমন একমাত্র আল্লাহর দিকে লক্ষ্য থাকে, তেমনি এ জগতেও যেন তাই থাকে।

(৭) সবরঃ মৃত্যুর সময়কালের মত এখানেও যেন সে সকল জাগতিক সম্ভোগ ত্যাগ করে ফেলে।

(৮) রোযাঃ মৃত্যুর সময়কালের মত জীবিতকালেও যেন নিজের ইচ্ছা-অভিরুচি পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার উপরই তুষ্ট হয়ে থাকে এবং তাঁর সনাতন হুকুম-আহকাম পালনে রত থাকে।

(৯) যিকিরঃ মৃত্যুর সময়কালের মত জীবিতকালেও যেন সে সকল কিছুর যিকির ও স্মরণ পরিত্যাগ করে কেবল আল্লাহর যিকির ও স্মরণেই লিপ্ত থাকে।

(১০) মুরাকাবাঃ মৃত্যুর সময়কালের মত এখানেও যেন সে নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ত্যাগ করে ফেলে।

মোটকথা, আল্লাহর মিলন প্রত্যাশির উচিত শায়খে কামেলের অনুসরণের মাধ্যমে বস্তুর দোষের ফল তথা সকল প্রকার অসৎ অভ্যাস থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং সৎ সুন্দর চারিত্রিক গুণাবলির দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করে তোলা এবং শুধুমাত্র আল্লাহর ধ্যান ব্যতিত আর কিছুই যেন তার অন্তরে স্থান না পায়।

৩। বায়আত গ্রহণের নিয়ম

বায়আত নেওয়ার সময় মুরীদকে নিজের সামনে আদব সহকারে বসিয়ে নিম্নোক্ত খুতবাটি প্রথমে পাঠ করা উচিত।

প্রথমে হামদ, ইস্তেগফার ও আউযুবিল্লাহ পাঠ করা এবং নিজ দোষক্রুটির স্বীকারোক্তি করে খোদার কাছে মাফ চাওয়া, আল্লাহর হেদায়েতের স্বীকৃতি দেয়া। অতঃপর কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করে পড়বেন, "ইয়া আইয়ো হাল্লাযিনা আমানোত্ তাকোল্লাহা ওয়াবতাগো ইলাইহিল ওয়াছিলাতি ওয়াজাহিদু ফি ছাবিলিহি লাআল্লাকুম তুফলিহুন-ইন্নালাযিনা য়ুবাইয়ুনাকা ইন্নামা য়ুবাইয়ুনাল্লাহ- পর্যন্ত পড়ে নিজের হস্ত মুরীদের হাতে রাখিবেন ও নিজেই বলিবেন, " আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। যে ব্যক্তি চুক্তি ভঙ্গ করে তার ক্ষতি তার উপরই বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও চুক্তি রক্ষা করিবে অতি শীঘ্র-তাকে মহা প্রতিদান দেওয়া হবে।" আল্লাহ আমাকে ও আপনাদের সকলকে উপকৃত করুন এবং বরকত দিয়ে অভিষিক্ত করুন। এরপর বলবেন শায়েখ আর পুনরাবৃত্তি করবে মুরীদ নিম্নোক্ত কথাগুলোঃ " আল্লাহ কে পালনকর্তা হিসেবে, ইসলামকে একমাত্র ধর্ম হিসেবে আর মুহাম্মদ (সাঃ) কে নবী হিসেবে আমি গ্রহণ করে নিলাম। এরপর মুরীদ কালেমা -এ-শাহাদাত পড়বে; পরে বলবে,

“আমি অমুকের পুত্র অমুক শায়েখের হস্তে অমুক সিলসিলা অনুসারে বায়আত হলাম।”

মুরীদ আরো বলবে, “আমি সকল প্রকার শিরক ও কুফর থেকে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করছি এবং আল্লাহ ও তাঁর সত্য নবীর উপর পুরোপুরি ঈমান আনছি। কেবলমাত্র ইসলামকেই আমার জীবনের একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করছি। কৃত গুণাহের জন্য আমি অনুশোচিত। ভবিষ্যতে সকল প্রকার গুণাহ থেকে বেঁচে থাকার ওয়াদা করছি। এরপর শায়েখ ও মরীদ খালেছ দিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন।

এরপর শায়েখ মুরীদের যোগ্যতা ও অবস্থা বিবেচনা করে যিকির করার তালিম দেবেন। অতঃপর শায়েখ মুরীদকে উত্তম ও ইসলামী উপদেশ দান করে বায়আত সম্পন্ন করবেন।

৪। চিশতিয়া তরীকার যিকির

(ক) তাওয়াজ্জুহ

যিকির শিক্ষা দিতে গিয়ে শায়েখ পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের রূহের উপর ফাতেহা ও খতম আদায় করার পর মুরীদকে পরপর তিনদিন একসঙ্গে রোযা রাখতে নির্দেশ দেবেন। এ তিনদিন কালিমায়ে তাইয়্যেবা, ইসতেগফার ও দরুদ শরীফ অধিক হারে আদায় করারও নির্দেশ দেবেন। অতঃপর এও বলবেন যে, তৃতীয় দিন শেষ রাতে বা বাদ ফজর বা বাদ আছর আমার নিকট আসবে। মরীদ যথাসময়ে হাযির হলে তাকে নির্জন কোন স্থানে নিয়ে যাবেন। সেখানে আর কেউ যেন না থাকে। তাকে আদবসহকারে সামনে বসিয়ে প্রথমে তাওয়াজ্জুহ দেবেন, যেন তাঁর মন সহজে যিকির ও শুগলসমূহ গ্রহণ করে নিতে পারে।

তাওয়াজ্জুহ্ দেবার নিয়মঃ মুরশিদ প্রথমে সমস্ত ধরনের ধ্যান ও চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবেন এবং পরে মুরীদের অন্তরকে নিজের অন্তরের মুখোমুখি করে তার অন্তরে আল্লাহর ইসমে যাত (অর্থাৎ আল্লাহ) এর জরব লাগাবেন। একথার ধ্যান করবেন যে, আমার মাধ্যমেই এ ব্যক্তির অন্তরে যিকিরের বর্তমান কাইফিয়্যাত হচ্ছে এবং এই যিকর তার অন্তরের রন্দ্রে রন্দ্রে গিয়ে প্লাবিত হচ্ছে। একশত একবার অন্তত এই জরব তিনি লাগাবেন যাতে আল্লাহর প্রতি বিপুল আগ্রহ ও যিকিরের উষ্ণতার প্রভাব ঐ মুরীদের অন্তরে গিয়ে প্রভাবশীল হতে পারে এবং তার অন্তর যেন যিকিরের আলোড়নে আলোড়িত হয়ে উঠতে পারে। অতঃপর শায়েখ

মুরীদের যোগ্যতা অবস্থা বুঝে যিকির বাতলে দেবেন। মুরীদকে শায়েখের নির্দেশিত যিকির-গুগলে মশগুল থাকতে হবে। বাতেনী ভেদসমূহ যেন অন্য কারো সামনে সে প্রকাশ না করে। এতে তার অধিক আনওয়ার ও বাতেনী ভেদ হাসিল হবে।

(খ) যিকির

সূফিগণের পরিভাষায় যিকির বলা হয় আল্লাহর স্মরণে এমনভাবে নিমগ্ন থাকা যেন আল্লাহ ব্যতিত বাকী আর সবকিছুই বিস্মৃত হয়ে যায় এবং হুযুরে ক্বালবের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সংসর্গের ধ্যান যেন তার অর্জিত হয়।

আল্লাহ পাক বলেন, “আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে এবং আমার নামের যিকিরে তার ঠোট নড়তে থাকে তখন আমি তার সঙ্গী হয়ে যাই আর আমাকে যে ব্যক্তি স্মরণ করে আমি তার সাথী।”

কুরআন পাকে রয়েছে, “সকাল বিকাল (সর্বক্ষণ) তোমার আল্লাহর যিকির কর।” আরো বলেন, “যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকে সে যেন সে সকল মুমিনদের অন্তর্ভূক্ত হয়।”

জেনে রাখ যিকির বহু প্রকার। পরম জনকে লাভ করাই হচ্ছে যিকিরের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং নামায, রোজা, দরুদ শরীফ, দু’আ অর্থাৎ যে আমল দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্যে সফল হওয়া যায় তাই মূলতঃ যিকির বলে গণ্য। কিন্তু যিকিরকারী যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে বিলুপ্ত না করতে পারবে যা দ্বারা আল্লাহ ব্যতিত আর সকল কিছু হতে সে বিস্মৃত হয়ে পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত লক্ষ্যে সফলকাম হওয়া সম্ভব

নয়। খোদা অন্বেষী ব্যক্তি ঐ মহান মরতবায় যখন পৌঁছাতে পারবে তখন সকল প্রকারের সদগুণাবলী দ্বারা সে সজ্জিত হয়ে যাবে। তার উপর তখন আনওয়ারে ইলাহীর এত তাজাল্লী হতে থাকবে যে, সে কেবলমাত্র মাযকুর অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাই তার সর্ব উপলব্দিতে বিরাজ করতে থাকবেন।

অতঃপর স্মর্তব্য, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কালিমার যিকির সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির বলে হাদীসে রসূলে (সাঃ) উল্লেখিত হয়েছে। ফলে অধিকাংশ পীর ও শায়েখ মুরীদদেরকে এই যিকিরেরই তালীম দিয়ে থাকেন।

(গ) যিকিরের স্তরসমূহ

যিকির চার প্রকার।

প্রথমতঃ যিকিরে নাসূতি যেমন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

দ্বিতীয়, মালাকুতী যেমন, ইল্লাল্লাহ।

তৃতীয়, জাবারুতি যেমন, আল্লাহ।

চতুর্থ, লাহুতি যেমন, হুয়া হুয়া। জেনে রাখ, যবানের যিকিরকে নাসূতী, ক্বালবের যিকিরকে মালাকুতী, রূহের যিকিরকে জাবারুতী, সিরের যিকিরকে লাহুতী বলে। আর যবানী যিকিরকে জিসমী (শারিরীক), ধ্যানরূপ যিকিরকে নাফসী (মানসিক), মুরাকাবা করাকে যিকিরে ক্বালবী, মুশাহাদা (সমক্ষ দর্শন) রূহানী যিকির এবং মুআয়ানা (উপস্থিত দর্শন) করাকে সিররি বলা হয়।

ফায়দাঃ যিকিরকারী এ সকল যিকির করার কালে লা ইলাহা বলার সময় পৃথিবীর সবকিছুকে নিজ থেকে অবলুপ্ত করে দিবে আর ইল্লাল্লাহ বলার সময় পুনরায় স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে স্থিরাবস্থায় নিয়ে আসবে।

(ঘ) বার তসবীহ যিকিরের বর্ণনা

নফী-ইসবাত। এই যিকিরের নিয়ম হলো, দুই দুই রাকাত করে বার রাকাত তাহাজ্জুদের নামায পড়বে সালিক। প্রতি রাকাতে তিনবার করে সূরা ইখলাস পাঠ করবে। পরে অতীব বিনয়ের ও খুশু-খুজুর সাথে তিন বা পাঁচ বা সাতবার হতে উঠিয়ে পড়বে-"হে আল্লাহ, তুমি ব্যতিত বাকী সব কিছু হতে আমার মন পাক করে দাও , তোমার মারিফাতের নূরে আমার ক্বালব আলোকিত করে তোল সব সময়ের জন্য, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! হে আল্লাহ!" পরে তওবা ইসতেগফার করে একুশবার পাঠ করবে, "আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহি।"

অতঃপর, "আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ! আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ! আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহ" এই দরূদ শরীফ, আরোহ ও অবরোহ তরীকায় তিনবার পাঠ করবে এবং চারজানু হয়েবসবে।

ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং এর পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলের সাহায্যে কীমাস নামক রগটিকে (হাঁটুর মধ্যস্থিত একটি শিরা) খুব চেপে ধরবে,

উভয় হাত হাঁটুর উপর ছেড়ে রাখবে এবং কেবলামুখী হয়ে বসবে। লাইলাহা বলার সময় শাহাদাত অঙ্গুলী উঠাবে এবং ইল্লাল্লাহ বলার সময় সেটি নামিয়ে ফেলবে। নিজেকে সুস্থির করে রাখবে এবং ইখলাস এবং মধুর আওয়াজে 'আউযু বিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ' পড়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' তিনবার এবং কালেমায়ে শাহাদাত একবার পাঠ করবে। এরপর মাথা এতটুকু ঝুকাবে যেন তা বাম হাটু পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে এবং লা ইলাহা উচ্চারন করতে করতে মাথা বাম হাঁটুর নিকট নিয়ে যাবে। একই দমে তিনবার 'জরব' লাগিয়ে মাথাকে পিঠের দিকে ঝুঁকাবে এবং ধ্যান করবে, এক আল্লাহ ব্যতিত অন্য সকল কিছুকে আমি পিছনে নিক্ষেপ করলাম। অতঃপর শ্বাস ছেড়ে পূর্ণ শক্তির সাথে দিলে ইল্লাল্ল্'র 'জরব' লাগাবে। তখন ধ্যান করবে হৃদয় আমার আল্লাহর ইশক ও মহব্বতে আপ্লুত হয়ে উঠছে। নফীর সময় চোখ খোলে রাখবে এবং ইসবাতের সময় চোখ বন্ধ করে ফেলবে। এভাবে উক্ত যিকির দু'শত বার করবে। একে 'যিকরে চাহার জরবী' বলে। প্রতি দশবার অন্তর অন্তর 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পাঠ করবে। প্রাথমিক স্তরের যাকেরগণ 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় 'লা মা'বুদা', মধ্যস্তরেরগণ 'লা মাকছু দা' এবং পূর্ণতা প্রাপ্তগণ 'লা মাওজুদা' এবং 'হামা উস্তের' (সকল কিছুতেই মূলতঃ তিনি এক আল্লাহ) ধ্যান করবে। এরপর কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে খেয়াল করবে- মুমিনের অন্তরে সততঃ আল্লাহর ফায়েজের স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

জেনে রাখ, বাম হাঁটুতে শয়তানী, ডান হাঁটুতে নাফসানী, ডান কাঁধে মালাকী আর অন্তরে রাহমানী খেয়াল বিদ্যমান। সুতরাং বাম হাঁটুর নিকটবর্তী হয়ে নাফসানী খাতরা, কাঁধ পর্যন্ত গিয়ে মালাকী

খাতরার নফী (অবলুপ্তী) করবে এবং ইল্লাল্লাহ-এর জরব লাগিয়ে রাহমানী খাতরার (খেয়াল) ইসবাত করবে।

ইসবাতে মুর্জারাদ ঃ

যাকের কোমড় সোজা রেখে উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখবে এবং দুই জানু হয়ে বসবে। মাথা ডান কাঁধের দিকে নিয়ে যাবে ও দিলের উপর ইল্লাল্লাহ'র জবর লাগাবে। এভাবে আকাধারে চারশত বার জরব লাগাবে। পরে একবার কালেমায়ে শাহাদাত ও তিনবার কালেমায়ে তাইয়েবা পড়ে কিছুক্ষণ মুরাকাবায় বসে থাকবে। পরিভাষায় একে এক জরবী যিকির বলা হয়ে থাকে।

ইসমে-যতে (আলস্নাহ) এর যিকির ঃ

'বল আল্লাহ এক এবং বাকী সকল কিছু পরিত্যাগ কর'-এই বাক্যের মর্মানুসারে এমনভাবে যিকির করবে যে, প্রথম আল্লাহ শব্দটির শেষ অক্ষরে পেশ(অর্থাৎ আল্লাহু) এবং দ্বিতীয় বারের আল্লাহ শব্দটির শেষ অক্ষরে জযম (অর্থাৎ আল্লাহ) দিয়ে যিকির করবে। আল্লাহু বলার সময় চক্ষু মুদে লতিফায়ে রূহ (ডান স্তনের নিম্নে অবস্থিত)-এ জরব লাগাবে আর আল্লাহ বলার সময় দিলের উপর জরব লাগাবে। এভাবে ছয়শতবার এই যিকির করবে। পরিভাষায় এই যিকির দুই জরবী নামে প্রসিদ্ধ। ছয়শত বারের মধ্যে আল্লাহু হাযিরী, আল্লাহু নাযিরী, আল্লাহু মায়ী-এই তিনটি কলেমার কোন একটি পাঠ করবে। অতঃপর ছয়শত বার পূর্ণ করার পর কালেমায়ে তাইয়েবা তিনবার, কালেমায়ে শাহাদাত একবার পড়বে। পরে ডান কাঁধের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে আল্লাহু আল্লাহু-এর জরব একাধারে কয়েকবার লাগাবে। পরে তিনবার কালেমায়ে শাহাদাত, এগারবার দরূদ

শরীফ এবং এগারবার ইসতেগফার পাঠ করবে। পরে ধ্যান ও হুযুরে ক্বালবীর সাথে এই সিলসিলার পীর ও মাশায়েখের রূহের উপর ইসালে সওয়াব করবে। এরপর যতক্ষণ মন চায় মুরাকাবা এবং যে যিকির তার ভালো লাগে সকাল পর্যন্ত তাতে মশগুল থাকবে। সম্ভব হলে ফজরের পর শায়েখের খেদমতে উপস্থিত হবে। যিকিরের পরে রাসুল (সাঃ) ও মাশায়েখে তরীকতদের পবিত্র রূহের উপর ফাতিহা ও ইসালে সওয়াব করবে।

৫। যিকিরের শুগল ও ওজীফা

৫. ১ .ঃ যিকির ও শুগলের পদ্ধতিসমূহ

দিলের মধ্যে দু'টি ছিদ্র বিদ্যমান। একটি নীচের দিকে। এর সম্পর্ক রূহের সাথে। অপর ছিদ্রটি হচ্ছে উপরের দিকে। যাকের যখন সফলভাবে যিকিরে লিপ্ত হয় তখন দিলের ঐ উপরের দরজাটি খুলে যায়। নীচের দরজাটি শুধু যিকরে খফীর (হাবসে দম বা শ্বাস বন্ধ করে যিকির করা) সাহায্যেই খোলা সম্ভব হয়। যিকির সমূহের মধ্যে মূল হচ্ছে এই হাবসে দম।

(ক) খাতরাতে ফাসেদা দূর করার যিকির

কোন মন্দ খেয়াল যদি দিলে মজবুত হয়ে বসে আর কোন ক্রমেই সেটি দূরীভূত না হয় তবে তা দূর করার উপায় হলো- শ্বাস নাভি থেকে টেনে ক্বালবে এনে থামবে এবং দিল থেকে কালেমা 'লা ইলাহা' বের করবে। অতঃপর ডান কাঁধ পর্যন্ত শ্বাস টেনে নেবে এবং দিলের উপর সজোরে "ইল্লাল্লাহ' -এর জরব লাগাবে। খেয়াল করবে, এই মার শয়তানের মাথার উপর মেরে ওর মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলাম এবং শয়তান আমার দিল থেকে এখন বের হয়ে গেছে। বিরামহীনভাবে একের পর এক এ ধরণের জরব লাগাতে থাকবে। আল্লাহ চাহেনতো অতি সত্বর ফাসেদ এবং বদখেয়াল সমূহ বিদূরিত হয়ে যাবে। শয়তানও বিতাড়িত হয়ে যাবে। মন যিকিরের নূরে আলোকিত হয়ে উঠবে। এই যিকিরের সময় খুব সতর্কতা চাই এবং চাই হাবসে দম। হাবসে দম থাকা এই ফাসেদ ওয়াসওয়াসা বিদূরণকারী যিকিরের একটি শর্ত।

(খ) শুগলে সেপায়া

আল্লাহু সামিয়ুন, আল্লাহু বাসীরুন, আল্লাহু আলীমুন এই ইসম সমূহের যিকিরকে শুগলে সেপায়া বলা হয়। অধিকাংশ মাশায়েখ এই যিকির করে থাকেন। এর তরীকা হলো-চার জানু হয়ে বসে ‘সুলতানান নাসীরা (আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী মহা রাজাধিরাজ) -এর মর্ম ধ্যান করবে। পরে শ্বাস নাভী থেকে উম্মুদ্দিমাগ বা মূল মস্তিষ্কে টেনে নেবে এবং আল্লাহু সামিয়ুন বলবে আর “বী ইয়াসমাউ (আমার মাধ্যমে তিনি শুনেন)-এই ধ্যান করবে। পুনরায় নাভিতে শ্বাস নিয়ে ‘আল্লাহু আলীমুন (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী) এই যিকির করে “বী ইয়ানতিকু (আমার মাধ্যমেই তিনি কথন করেন) এই ধ্যান করবে। অতঃপর পুনরায় শুরু করে উম্মুদ্দিমাগে ‘আল্লাহু আলীমুন’ এবং নাভিতে “আল্লাহু সামিয়ুন” -এর জরব আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতিতে লাগাতে থাকবে যেন এক শ্বাসে একশত একবার শুগলে সেপায়া করার অভ্যাস হয়ে যায়। এটুকু করতে পারলে সালেক জামালে ইলাহী ও ঐশী সৌন্দর্যরাজীতে অভিষিক্ত হতে পারবে।

এই শুগলের ফলে তিনটি মৌলিক হাল তৈরী হয়।

এক-নফল ইবাদাত সমূহের প্রতি নৈকট্য।

দুই- ফরজ ইবাদাত সমূহের প্রতি নৈকট্য।

তিন-সালেক বুঝতে পারবে যে, তার কোন কিছুর নির্ধারণই খোদ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারণ।

ফায়দাঃ

কুরব বা নৈকট্য দু'প্রকার। কুরবে-নাওয়াফেল ও কুরবে-ফারায়েয। প্রথমটির অর্থ হলো-মানবিক গুণসমূহ অবলুপ্ত হয়ে সালেকের মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী ও শক্তির সৃষ্টি হওয়া। দ্বিতীয়টির অর্থ হলো- আল্লাহ ব্যতিত সকল কিছুর অস্তিত্বের উপলব্দি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এবং সালেকের অন্তরে আল্লাহর অস্তিত্ব ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্বের ধ্যান না থাকা। ফানাফিল্লাহ'র মর্ম এটিই আর ইহাই হচ্ছে কুরবে ফারায়েযের ফল।

(গ) শুগলে সুলতানুল আযকারঃ

সংকীর্ণ ও অন্ধকার এমন একটি ক্ষুদ্র কুঠুরী নির্বাচন করবে, যেখানে বাইরের শোরগোলের শব্দ প্রবেশ না করতে পারে। পরে দরূদ, ইসতিগফার এবং আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার পর একাগ্রচিত্তে তিনবার "আল্লাহু আ'তনী নূরাও ওয়াজআল নী নূরাও ওয়া'যায়ালী নূরাও ওয়াজ আলনী নূরা" "আল্লাহ আমাকে নূর দিন, আমার জন্য নূর দিন, নূর আমার বড় করে দিন, আমার সম্পূর্ণ সত্তাকে আপনি নূর বানিয়ে দিন।" এই দু'আ পাঠ করবে।

এরপর শুয়ে বা বসে বা দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ শরীর ঢিলা ও অসাড় করে রাখবে এবং নিজেকে মৃত বলে ধ্যান করবে। পরে আপাদমস্তক ধ্যানস্থ হয়ে শ্বাস গ্রহণের সময় 'আল্লাহ' এবং শ্বাস ত্যাগের সময় 'হু' বলার ধ্যান করবে। শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের সময় প্রতিটি লোমকূপ থেকে এর যিকর হচ্ছে বলে খেয়াল করবে। এতে এমনভাবে নিজেকে নিমগ্ন করে রাখবে যেন স্বীয় অস্তিত্বও তার নিকট বিলুপ্ত হয়ে যায়। 'হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম' সতত এই খেয়াল ও ধ্যান

নিজের মধ্যে জাগরুক রাখবে। এর ফলশ্রুতিতে কিছুদিনের মধ্যেই তার এমন অবস্থা হবে যে, প্রতিটি চুল এবং লোমকে সব সময় যিকির করতে দেখা যাবে এবং তার সর্বাঙ্গ আল্লাহ্‌র তাজাল্লীর নূরে সমুজ্জল হয়ে উঠবে।

(ঘ) সুলতানুল আযকার যিকিরঃ

পঞ্চেন্দ্রিয় তুলা বা আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে নাভির তল থেকে শ্বাস টেনে উম্মুদ্দিমাগে নিয়ে গিয়ে থামবে এবং সেখান থেকে দিলের মাঝে টেনে নিয়ে ক্বালবী যিকিরসহ বস্তু উপাদানে গঠিত মনের কথন শ্রবনের সাথে উম্মুগদ্দিমাগে অবস্থিত উজ্জ্বল নুকতায় থামবে। অনেকে উক্ত নুকতাকে ‘লতিফায়ে -এ -আখফা’ নামেও অভিহিত করে থাকেন। উক্ত যিকিরে এমনভাবে মশগুল হয়ে থাকবে যেন ক্রমেঐ নুকতাটি বিস্তৃত থেকে বিস্তৃতর হতে থাকে আর সমস্ত শরীর এর প্রভায় সমুজ্জল হয়ে উঠে। এরপর আল্লাহর আরশ হতে হীন এ পৃথিবী- পর্যন্ত সকল কিছুই নূরে প্রোজ্জ্বল হয়ে গেছে বলে দৃষ্টি গোচর হতে থাকবে এবং এ-নূরের মাধ্যমে আল্লাহ ও ফেরেশতাগণেরও সুরত দৃশ্যমান হয়ে উঠবে।

সালেক যদি এই স্তরে উঠতে পারে তবে সে স্বীয় সত্তাকে নিখিল বিশ্বের নিয়ন্তা বলে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। এই স্তরের সালেককে স্বীয় গুণসমূহকে আল্লাহরই গুণ বলে ভাবতে হবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন অদৃশ্য সম্মানে বিভূষিত করে থাকেন।

৫.১ মুরাকাবা পদ্ধতির বর্ণনা

(ক) মুরাকাবা পদ্ধতি

সালেক যখন জাহেরী ও বাতেনী অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক সকল ধরণের নূরে সমুজ্বল হয়ে উঠে এবং তার শিরা -উপশিরায় যিকিরের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে তখন তার মধ্যে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিমোহনের এক দশার সৃষ্টি হয়। আর এ সময়েই তাকে মুরাকাবা ও ধ্যান পদ্ধতির প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রকৃষ্ট সময়।

মুরাকাবা কয়েক প্রকার। তালেব বা খোদা প্রত্যাশী ব্যক্তি যে পদ্ধতিতে উপকার পায় এবং যে পদ্ধতি গ্রহণ করলে সে শ্রীঘ্র মনযিলে মকসূদে পৌঁছাতে সক্ষম হতে পারে, সে পদ্ধতি অনুসারেই তার কাজে লেগে যাওয়া উচিত। কতিপয় মুরাকাবা পদ্ধতি এবার লেখা হচ্ছে।

(খ) পথম পদ্ধতিঃ

নামাযের তাশাহুদের সময়ের ন্যায় দুই জানু হয়ে বসে দুই হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে আল্লাহ ভিন্ন অন্য সবকিছু হতে মনকে বিমুক্ত করে একান্ত ধ্যানে আল্লাহর দরবারে নিজেকে হাজির করে ‘আউযুবিল্লাহ’ ও ‘বিসমিল্লাহ’ পড়ার পর ‘আল্লাহ হাযিরি, আল্লাহ নাযিরী, আল্লাহু মায়ী’ পাঠ করবে এবং একাগ্র চিত্তে এগুলোর মর্ম ধ্যান করবে। এই ধ্যানে এত মগ্ন হবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু এমনকি স্বীয় অস্তিত্বের খেয়ালও যেন তার বিলুপ্ত হয়ে যায়।

(গ) দ্বিতীয় মুরাকাবাঃ

তিনটি কারণে মানুষের মন আল্লাহ বিমুখ হয়। এক, হাদীসে নাফস অর্থাৎ গোপনে ও প্রকাশ্যে স্বীয় নাফসকে স্বেচ্ছায় কাল্পনিক আলোচনায় বিভোর রাখা। দুই, মনে অনিচ্ছাকৃত সৃষ্ট ধারণা ও আশংকাসমূহ অর্থাৎ নাফসী খাতারাত। তিন, অন্য জিনিসের প্রতি লক্ষ্য প্রদান বা জাগতিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া। বাতেনী শুগল আশগাল হচ্ছে এ সমস্ত রোগের মূল চিকিৎসা। হাদীসে নাফসের বেলায় ইসমে যাত আর নফসানী খাতরাতের বেলায় আল্লাহর মৌলিক গুণবাচক নামসমূহের ধ্যান করা উচিত। এর সঙ্গে মুর্শিদের প্রতিও দিলের তাওয়াজ্জুহ রাখতে হবে।

(ঘ) মুরাকাবা -এ -রূয়াত

এই মুরাকাবায় আল্লাহর দর্শনের ধ্যান করবে। “আলাম ইয়া’লাম বিআন্নল্লাহা য়ারা” অর্থাৎ “ইহা কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন?” এই আয়াতের উপর গভীর লক্ষ্য নিবদ্ধ করবে। সর্বদা এ ধ্যান অন্তরে জাগরুক রাখবে, যেন ক্রমে তার মধ্যে ঐ পরম সুরতকে প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

(ঙ) মুরাকাবা-এ-মায়িআত

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন “ওয়াহুয়া মাআকুম আইনামা কুন তুম” অর্থাৎ যেখানেই তোমরা থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এই আয়াতের মর্ম ধ্যান করবে। দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে, গোপন ও প্রকাশ্য, সুস্থতা ও অসুস্থতা সকল অবস্থায় আল্লাহ আমার সঙ্গে রয়েছেন। আর এই ধ্যানেই সর্বদা বিভোর হয়ে থাকবে।

(চ) মুরাকাবা-এ-আকরাবিয়্যাত

আল্লাহ পাক বলেন, "নাহনু আক্বরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ" অর্থাৎ শাহরগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী আল্লাহ। এই আয়াতের অর্থ ও মর্মের প্রতি খেয়াল করে ধ্যান করবে। আর আল্লাহ আমার নিকটবর্তী-এই ধ্যানের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকবে।

(ছ) মুরাকাবা-এ-ওয়াহাদাত

হামা উস্ত বা সবকিছুতেই আল্লাহ এবং হুয়াল আওয়ালু, হুয়াল আখির' বা আদি এবং অন্তে কেবলমাত্র তিনি (আল্লাহ)-এ কথা মুখে বলবে এবং ধ্যান করবে যে, তিনি ব্যতিত কোথাও কিছু নেই। আর এই ধ্যানেই আত্ম বিভোর হয়ে থাকবে।

(জ) মুরাকাবা-এ-ফানাঃ আল্লাহ তায়লা ইরশাদ করেন, "কুল্লু মান আলাইহা ফান ওয়া য়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালী ওয়াল ইকরাম"। এই আয়াত টি'র মর্ম খেয়াল করে এই ধ্যান করবে যে, সবকিছুই একদিন ফানা বা শেষ হয়ে যাবে আর সকল প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দোষ থেকে পবিত্র আল্লাহ পাকই কেবল সর্বদা বিরাজিত থাকবেন। মানসচক্ষে এ অবস্থাটি অবলোকন করবে এবং এ ধ্যানেই নিমগ্ন হয়ে থাকবে। তাতে উক্ত বিষয়টির মর্ম তার নিকট আরো সুস্পষ্ট, আরো উদঘাটিত হয়ে যাবে। স্বীয় অস্তিত্বের অনিত্যতা এবং স্বীয় জ্ঞান এবং বুদ্ধির অক্ষমতা ও বিলুপ্তি আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

৫.৩ ফানার বিভিন্ন স্তর

ফানার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তরেরও নির্দিষ্ট সীমা বিদ্যমান। যিকিরে জিসিম, নাফসী যিকির, যিকরে দিল, যিকরে রূহ, যিকরে সির-এ পাঁচটি স্তর যেমন যিকরে রয়েছে তেমনি ফানারও পাঁচটি স্তর রয়েছে।

১ম স্তর যিকরে রব্বানীর প্রাধান্য স্তর। একে যিকরে জিসমীও বলা হয়। এর প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে নাফসে আম্মারার বৈশিষ্ট্য তথা চারিত্রিক দোষসমূহ শরীয়ত নির্দেশিত চারিত্রিক ও নৈতিক গুণরাজিতে বিলীন হয়ে যায়।

২য় স্তরঃ যিকির ও ধ্যানের প্রাধান্য স্তর। একে যিকরে নাফসীও বলা হয়। এর প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে নাফসে লাওয়ামার বৈশিষ্ট্য তথা জৈবিক লিপ্সাসমূহ ইমকানী খায়েশ বা সম্ভাব্য প্রয়োজনের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। ফলে শরীয়তের নির্দেশগুলোর উপর দৃঢ়ভাবে পাবন্দ থাকা সম্ভব হয় এবং নাফসে মুলহিমের স্তর তথা মুকুশাফা ও ইলহাম, অদৃশ্য রহস্য উদঘাটন ও অদৃশ্য শক্তির নির্দেশ প্রাপ্তির পদ্ধতি সমূহ তার নিকট উন্মোচিত হয়।

৩য় স্তরঃ

যিকরে ক্বালবীর প্রাধান্যের মাধ্যমে অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহের কাজ ও গুণাবলী প্রকৃত অস্তিত্বের অধিকারী সত্তা আল্লাহর কাজ ও গুণাবলীতে লীন হওয়া। যাতে প্রতিটি বস্তুতে এবং প্রত্যেক কাজে কেবলমাত্র আল্লাহরই তাজাল্লী সালেকের দৃষ্টিগোচর হতে পারে

এবং সে নাফসে মুতমাইন্নার স্তর ইতমিনানে ক্বালবী বা মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

৪র্থ স্তরঃ যিকিরে রূহের প্রাধান্য স্তর। একে মুশাহাদাও বলা হয়। এর প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে সকল ধরণের আধিক্য আল্লাহর একত্বে লীন হয়ে যায়। এমনকি সালেকের সম্মুখে আল্লাহর যাত প্রত্যক্ষ করা ভিন্ন আর কিছুই যেন না থাকে- সেটি লাভ হয়। এই স্তর 'মাকামে মুশাহাদা' নামে অভিহিত হয়।

৫ম স্তরঃ যিকিরের স্বাদ গ্রহণ করার প্রতি লক্ষ্য না থাকা এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রতি বিরাগের নাম হচ্ছে যিকরে সিররী। এই যিকিরের বৃদ্ধির মাধ্যমে সালেকের স্বীয় সত্তাকে অনন্ত সত্তার মাঝে লীন করে দেয়াই হচ্ছে এই স্তর। সালেকের তুষ্টি এর মধ্যেই নিহিত যে, স্বীয় অস্তিত্বের উপলব্দি যেন তার না থাকে। কারণ, নিজের উপলব্দি যদি তার থাকে তবে ফানাইয়্যাত বা আত্ম-লীন হবার ধ্যান তার বিনষ্ট হয়ে যাবে। এই স্তরে সালেক ফানা-উল-ফানা বা আত্ম-লীনের ধারণাও লীন হবার স্তরে গিয়ে উপনীত হয়। তখন স্বীয় জ্ঞান বা অস্তিত্ব ইত্যাকার কোন বোধ আর বাকী থাকে না।

এই পর্যায়ে সালেক স্বীয় লক্ষ্য সায়র ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে যাত্রা) এবং স্বীয় ধ্যান 'সায়র ফীল্লাহ' (অনন্ত সত্তায় পরিভ্রমন) সব সমাপ্ত করে পরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়ে তার প্রকাশই সকল সৃষ্টির মূল কার্যকারণ-এ কথার জ্ঞান লাভ করতে পারে। সালেকের স্বীয় অস্তিত্ব তখন একেবারে বিলীন হয়ে যায়।

এই মর্তবার তাজাল্লী একবার মাত্র যদি কোন সালেকের উপর পড়ে তবে সে ওলীয়ে কামেলে পরিণত হয়ে যায়। এই ফানা ও স্বীয় সত্তা বিলীনের স্তরে আল্লাহ যখন তার প্রিয় বান্দাকে স্থায়িত্ব দিতে চান তখন স্বীয় নূর ও জ্যোতিরশ্মির মাধ্যমেই তাকে স্থায়িত্ব দেন। এই স্তরকে বলে 'জমউল-মজা' বা একত্রিত্বের একত্রিত স্তর। আর এই স্তরই হচ্ছে সর্বশেষ স্তর।

অমূল্য উপদেশাবলী

তরীকতপন্থীদের জন্যে অমূল্য সম্পদ

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ) এর

অমূল্য উপদেশাবলী

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ) এর অমূল্য উপদেশাবলী

অনুবাদ

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

মূল ইংরেজী

শেখ শাজাদ খান, আস-সুফফা ইন্সটিটিউট, বার্মিংহাম

অনুবাদকের কথা

অধম বহুদিন ধরে বাংলা ভাষায় লিখিত হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ) এর সংশ্লিষ্ট কিতাবাদি খোঁজে ছিলাম। তাঁর মত তাসাউফের ইমামের জীবনী, বাণী ও লিখিত কিতাব তরীকতপন্থীদের জন্য মৃতসঞ্জীবনী। তাঁর জীবনী 'হায়াতে এমদাদ' বাজারে পাওয়া যায়। আলহামদুলিল্লাহ। তার লেখা যিয়াউল কুলুব অনুদিত হয়েছে। সেখান থেকে কিছু অংশ এ গ্রন্থে তুলে দেয়া হয়েছে। এরপর আর কিছুই পাচ্ছিলাম না। অতঃপর ইন্টারনেটে ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম এর আস-সুফফা ইন্সটিটিউটের শেখ শাজাদ খান অনুদিত The Counsel of Haji Imdadullah Muhajir Makki হাতে আসে। আমি খোঁজখবর নিয়ে এটির শুদ্ধতার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে এর বাংলা অনুবাদ করি। যদিও কাজটি ক্ষুদ্র কিন্তু এর তাৎপর্য্য অনেক বলে এই অনুবাদ নিয়ে আমি ভীতসন্ত্রস্ত। তবে অন্তরের ইখলাস যথেষ্ট ছিল বিধায় আমি আশাবাদিও । পাঠক যারা তরীকতপন্থী তারা এই ক্ষদ্র গ্রন্থে জীবনপথের মূল্যবান দিকনির্দেশনা পাবেন যেমন আমি এ কদিনেই এ থেকে যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হয়েছি। অনুবাদের ভুলক্রুটির জন্যে আমি আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমার প্রত্যাশি। পাঠকের কাছে দরখাস্ত, তারা যেন অধমের দুনিয়া আখেরাতের কামিয়াবির জন্যে খাস দিলে দোয়া করেন।

ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক
অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

তরীকত সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'টি কথা

কোন কাজ করতে হলে সে কাজের নিয়মনীতি জানা আবশ্যক। বিশেষতঃ ব্যবহারিক বিষয়ের জন্য হাতে কলমে শিক্ষা নেয়ার জন্য ঐ বিষয়ের শিক্ষক বা Practitioner এর সঙ্গে থেকে বিষয়টি শিখতে হয়। ইসলামী শরীয়ত একটি ব্যবহারিক বিষয়। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আল্লাহর আদেশ নিষেধ ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নত পালন করে চলার নামই শরীয়ত অনুসরণ। শরীয়ত অনুসরণ করার পথ ও পদ্ধতি কেবল গ্রন্থ্ পাঠ ও ওয়াজ শুনে আয়ত্ত হয় না। শিক্ষক বা মুর্শিদের সঙ্গে থেকে অনুশীলনের মাধ্যমে তা আয়ত্ত হয়। অনুধাবন করুন যে, আল্লাহতায়ালা কেবল কুরআন নাযিল করেন নি বরং কুরআনের শিক্ষা ব্যবহারিক জীবনে কীভাবে পালন করতে হবে তা শিক্ষা দেয়ার জন্য কুরআনের বাস্তবচিত্র হিসেবে রাসূল (সাঃ) কে প্রেরণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাঃ) কে দেখে দেখে ইসলাম অনুশীলন করেছেন।

ইসলামের ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়ার জন্য সকল যুগেই সত্যপন্থী ব্যক্তিত্ব থাকবেন মর্মে কুরআনী প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহতায়ালা ঐ সব সত্যপন্থীদের সঙ্গী হয়ে ব্যবহারিক ইসলাম শিক্ষার আদেশও দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, "হে ঈমানদারেরা,

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যপন্থীদের সঙ্গী হয়ে যাও।” (আল-কুরআন, ৯ঃ ১১৯)।

বস্তুত ইসলামের ব্যবহারিক শিক্ষার প্রধানতম স্তম্ভই হলো আল্লাহকে ভয় করে সকল পাপ ও মন্দ কর্ম পরিহার করা এবং পূণ্য ও পবিত্র কর্মে আত্মনিয়োগ করা । এ কাজ শিখতে হলে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা হলো সত্যপন্থীদের সঙ্গী হয়ে যাওয়া। রাসূল (সাঃ) এর যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান প্রধানত এই পন্থায়েই হয়েছে।

কোন পরহেজগার, খোদাভীরু, শরীয়তঅনুসারী, খাঁটি আলেম যিনি পূর্ববর্তী অনুরূপ শিক্ষকের নিকট থেকে দ্বীনের ব্যবহারিক শিক্ষা পেয়েছেন এবং তা পরবর্তীদের মাঝে পৌঁছাবার ইযাযতপ্রাপ্ত, তেমন একজন ওলীর সোহবতে থেকে দ্বীনী বিষয়াদীর ব্যবহারিক শিক্ষা নেয়ার নামই তরীকত । এটি কোন নব আবিষ্কার বা বেদআত নয়। তরীকত হলো শরীয়তের শিক্ষা অনুসরণের জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি যে পন্থায় চেষ্টাসাধনা করেন তার অপর নাম। এ কোন তুচ্ছতাচ্ছিল্যের বিষয় নয় বরং পূর্ববর্তী যুগ থেকে অনুসৃত হক ও সুন্দর, কার্যকর ও প্রশংসনীয় এক কর্মপ্রচেষ্টা যার মাধ্যমে মুসলমান দুনিয়ার অস্থির জীবন শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করে কবরে, হাশরে শান্তি লাভ করবে ও পরিশেষে জান্নাতের মহানেয়ামত লাভ করে ধন্য হবে। ইতিহাসের পাতায় এমন কোন খাঁটি আলেম-ওলীর দেখা পাওয়া যায়না যিনি তরীকতের নিন্দা করেছেন কিংবা একে গ্রহণ না করেছেন।

--------ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ)

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ) ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের সাহারানপুর জেলার নানুতা নামক শহরে ১৮১৭ ইং সনের ৩১ শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরআনের হাফেজ ছিলেন। ৯ বছর বয়সে দিল্লী গমন করেন এবং আরবী, ফারসী শিক্ষা করেন। তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তেমন এগোয়নি বরং তিনি রূহানিয়াতের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ১৮ বছর বয়সে শায়েখ মাওলানা নাসিরুদ্দিন নকশবন্দীর হাতে বয়েত হন ও অল্প কদিনের মধ্যে ইযাযত লাভ করেন। ইত্যবসরে তিনি হুজুর (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখেন ও এই স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝানঝানবীর হাতে পুনরায় বয়েত হন। অল্প কদিনের মধ্যে শায়েখ তাকে খেলাফত দিয়ে ধন্য করেন। মিয়াজী (রহঃ) এর ইন্তেকালের পর তিনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে পড়েন এবং লোকালয় থেকে দূরে পাঞ্জাবের বনবাদাড়ে থাকা শুরু করেন। এসময় তিনি একাধারে ৮দিন পর্যন্ত অনাহারে থাকতেন। ৬ মাস লোকালয় থেকে দূরে থাকার পর পুনরায় তিনি নবী করীম (সাঃ) কে স্বপ্নে যিয়ারত করেন এবং এর ভিত্তিতে হজব্রত পালনের জন্যে মক্কায় তশরিফ নিয়ে যান। মদীনার যিয়ারত শেষে হযরত শাহ ইসহাক মুহাজীরে মক্কীর নির্দেশে ভারতে চলে আসেন। ভারতে ফিরে আসার পর লোকেরা তার নিকট বায়াত হবার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করে কিন্তু তিনি বিনয়ের সাথে অপারগতা প্রকাশ করতে থাকেন। অবশেষে যখন তিনি বুঝতে পারেন যে এ হলো খোদার অভিপ্রায়, তখন থেকে লোকদের বায়াত করা শুরু করেন।

১৮৫৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি থানাভনে আযাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এরই ধারাবাহিকতায় এক যুদ্ধে, যা শামেলীর যুদ্ধ নামে মশহুর, তিনি সিপাহসালারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে পরাজয়ের পর আলেম সমাজের জীবনে অবর্ণনীয় জুলুম নির্যাতন নেমে আসে। বাধ্য হয়ে অতঃপর তিনি ভারতের মাটি চিরকালের জন্যে ত্যাগ করে মক্কায় হিজরত করেন।

মক্কায় তিনি প্রথম দিকে খুবই কষ্টে ছিলেন। অতঃপর আল্লাহতায়ালা তার জন্যে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে বেলায়েতের এক ঈর্ষনীয় মাকাম দান করেন। যদিও তিনি বড় আলেম ছিলেন না কিন্তু তার বেলায়েত আরব আজমের সর্বত্র স্বীকৃতি পেয়েছে এবং প্রায় ৫০০ আলেম তার কাছে বয়েত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ), কুতবে যমান মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহঃ) ও মুজাদ্দিদে যমান মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) অন্যতম। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মদনী (রহঃ) মক্কায় তাঁর কাছে সুলুকের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তাঁর সোহবতে লক্ষ লক্ষ খোদাপ্রেমিক সঠিক পথের দিশা লাভ করেছেন।

হযরত হাজী সাহেবের (রহঃ) এত্তেবায়ে শরীয়ত ও কারামত

তাসাউফের উচ্চতর মর্যাদা লাভের পরও হাজী সাহেব (রহঃ) জাহেল সূফীদের বিপরীতে শরীয়তের উপর খুবই মজবুত ও পাবন্দ ছিলেন। প্রত্যেক কাজে ও কথায় এবং চালচলন, উঠাবসায় সর্বদা সুন্নতের প্রতি সূক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি সাহেবে কারামত হওয়া সত্ত্বেও কারামতকে তাসাউফের ও বেলায়েতের দলিল মনে করতেন না। একদা হযরত হাজী সাহেবের বাসায় অনেক মেহমান আসেন। প্রয়োজনের তুলনায় খাবার কম ছিল। হাজী সাহেব (রহঃ) নিজ রুমাল পাঠিয়ে আদেশ করলেন খাবার ঢেকে রাখতে। ফলে খাবারে এত বরকত হলো যে সকলে খাওয়ার পরও অনেক খাবার রয়ে যায়। এই ঘটনা হযরত জামেন শহীদ (রহঃ) জানতে পেরে বললেন, হযরত আপনার রুমালের ছালামতি কামনা করি যেহেতু অভাব আর দেখা দিবে না। হাজী সাহেব (রহঃ) লজ্জিত হয়ে বললেন, বাস্তবিকই ভুল হয়ে গেছে। তওবা করছি, ভবিষ্যতে আর কখনো এমন হবে না।

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) এর মশহুর কারামত যা বিভিন্ন কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে তা এই, ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক ও মুজাহিদগণকে ইংরেজরা যখন খুঁজে খুঁজে গ্রেফতার করছিল তখন হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) আম্বালা জেলার অন্তর্গত কানজালা নামক স্থানে রইছ জনাব রাও আবদুল্লাহ সাহেবের বাসভবনে আত্মগোপন করে ছিলেন। তখন জনৈক ইংরেজ জেলা প্রশাসককে

সংবাদ দিল যে মোজাফফরনগর জেলার জেহাদের আসামী হাজী সাহেব তাঁর মুরীদ রাও আবদুল্লাহ সাহেবের আস্তাবলে আছেন। এ খবর পেয়ে জেলা প্রশাসক নিজেই রাও আবদুল্লাহ সাহেবের বাড়ী এসে বললেন, আমি খবর পেয়েছি আপনার নিকট ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর তেজস্বী ঘোড়া আছে। আমি ঐগুলি দেখতে চাই। অতঃপর আস্তাবল খুলে দেয়া হলো। আর হাজী সাহেবের মুরীদ রাও সাহেব খুবই আতঙ্কিত হয়ে গেলেন। ইংরেজ জেলা প্রশাসক ভেতরে ঢুকে দেখল জায়নামাজ বিছানো, অজু করার বদনা মজুদ, পানি দ্বারা মাটি ভেজা। জেলা প্রশাসক রাও সাহেবকে প্রশ্ন করলেন আস্তাবলে নামাজের ব্যবস্থা কেন। রাও সাহেব বললেন, ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ফরজ নামাজ মসজিদে পড়া এবং নফল নামাজসমূহ ঘরে পড়া উত্তম। অতএব আমরা নফল ইবাদাত করার ব্যবস্থা ঘরেই করে থাকি। সুতরাং একারণেই এখানে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অতঃপর জেলা প্রশাসক যখন চলে গেলেন তখন হাজী সাহেব (রহঃ) কে জায়নামাজের উপরই দেখা গেল। এ হলো একটি কারামতের ঘটনা। হাজী সাহেব (রহঃ) এর জীবনে আরো অনেক কারামতের দেখা মেলে। তিনি আরব ও আজমের সর্বজন স্বীকৃত শায়েখ ছিলেন। তখনকার সময়ের আউলিয়াগণ হাজী সাহেবের বেলায়েতের উপর একমত ছিলেন এবং ঐ যুগের উলামায়ে কেরাম হাজী সাহেবের ইলমের উচ্চ মর্যাদা স্বীকার করতেন। আল্লাহতায়ালা তাঁকে ইলমে লাদুন্নী দ্বারা ধন্য করেছিলেন।

হাজী সাহেব (রহঃ) ৫০/৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। অতঃপর গায়েবী ইশারায় আদিষ্ট হয়ে তাঁর ভক্ত সৈয়দ হায়দার আলীর স্ত্রী বিবি নুরানের অনুরোধে তার নাতনী খাদিজার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অতঃপর তিনি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আরো দুই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু কোন স্ত্রীর তরফেই তাঁর কোন সন্তান জন্ম নেয় নি। শেষ জীবনে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলেন। অতঃপর ১৮৯৯ সনের ১৮ই অক্টোবর বুধবার ফজর আযানের ওয়াক্তে তিনি মাওলায়ে হাক্কিকীর উদ্দেশ্যে এই নশ্বর ধরাধাম ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। পবিত্র মক্কার জান্নাতুল মুয়াল্লায় তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ)

এর

অমূল্য উপদেশাবলী

---হে আল্লাহর পথের পথিক, সর্বপ্রথমেই তোমার আকিদা-বিশ্বাস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুরূপ করে নেয়া উচিত।

---তুমি শরীঅতের জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা কর যেন তোমার প্রভুর অধিকার ও অন্যান্য লোকদের অধিকার ঠিকমত আদায় করতে সক্ষম হও।

---কুরআন ও রাসূলের (সাঃ) সুন্নতের অনুসরণ কর এবং অনুসরণ কর সাহাবাগণের।

--- চরিত্রের মন্দ আমল-আখলাক বর্জন কর। সেগুলো হলোঃ লোভ, কাল্পনিক আশা-আকাঙ্খা, ক্রোধ, মিথ্যাকথন, গীবত, কৃপনতা, হিংসা, রিয়া, অহংকার, এবং ঘৃণা।

---চরিত্রের সুন্দর আমল-আখলাক অবলম্বন কর। সেগুলো হলোঃ সবর, শোকর, অল্পেতুষ্টি, ইলম, ইয়াকীন, আল্লাহতে সমর্পন (তাফবীয) আল্লাহর উপর নির্ভরতা (তাওয়াক্কুল), আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরে সন্তুষ্টি (রেযা বিল কাযা), এবং ভাগ্যবরণ।

---শরীঅতের অনুসরণে দৃঢ় হও এবং সকল প্রকার হারাম থেকে বেঁচে থাক।

---তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন কর।

---সর্বদা নবীর (সাঃ) সুন্নাত অনুসরণ কর এবং নিষিদ্ধ ও সন্দেহজনক কাজকর্ম থেকে বিরত থাক।

---যদি গোনাহ করে ফেল তবে তখন তখনই তাওবা কর এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ নেককাজ কর ও আল্লাহর দরবারে রোনাজারী করে ক্ষমা চাও। কখনোই তাওবা করতে বিলম্ব করোনা।

---পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় কর।

---ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত এবং নফল থেকে ফারেগ হয়ে মুর্শিদের নির্দেশিত কাজে লেগে থাক।

---অত্যধিক দোয়া দরূদ সম্পন্ন করার প্রতি আকর্ষণের চেয়ে অন্তরকে আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারা রাখা ভাল।

---যখন আল্লাহর স্মরণে তৃপ্তি লাভ হয় তখন সেজন্যে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

---সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে কর।

---কাশফ ও কারামতের আকাঙ্খী হইওনা।

---যখন বসত আসে তথা ইবাদাত-বন্দেগীতে আগ্রহ-উদ্দীপনা জাগে তখন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং শরীঅতের সীমারেখার প্রতি যত্নবান হও।

---যখন কবয আসে তথা ইবাদাত-বন্দেগীতে মন লাগে না তখনও হতাশ হইওনা বরং জোশের সাথে ইবাদাত-বন্দেগীতে লেগে থাক।

---যা অর্জন করেছ তার তুলনায় নিজেকে ছোট ভাব এবং অর্জিত বিষয়ে নিজেকে ত্রুটিযুক্ত ভাব।

---মারেফাতের গোপন তত্ত্ব-তথ্য তেমন লোকদের কাছে প্রকাশ করো না যারা এবিষয়ে অজ্ঞ।

---নিজ অন্তরের হালাত-কাইফিয়াত নিজ মুর্শিদ ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রকাশ কর না।

---পৃথিবী ও এর সংশ্লিষ্ট সকল কিছু পরিত্যাগ কর, অন্যথায় সহস্র বছরের অধ্যাত্মসাধনায়ও কিছু মিলবে না।

---অন্তর হলো স্বচ্ছ এক আয়না, এর উপর আল্লাহর নূর ছাড়া অন্যকিছু প্রক্ষিপ্ত হতে দিয়ো না।

---সর্বদা পদ-লোভ, নেতৃত্বের মোহ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও; পদলিপ্স্যা এক ধোঁকা।

---সময় এক বড় নেআমত, অতএব প্রজ্ঞার সাথে এর সদ্ব্যবহার করা উচিত। উদাসীনতায় সময় কাটিয়ো না। অবহেলায় হারানো সময়ের ক্ষতি পূরণযোগ্য নয়।

---পার্থিব বিষয়াদির বিবর্তন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কঠোর অধ্যাবসায়ের সাথে সুলুকের পথে লেগে থাক।

---ভন্ড সূফি ও বেদআতিদের থেকে পালাও, যদিও তারা অলৌকিক কান্ডকারখানা করে দেখায়।

---সচ্চরিত্রতা ও বিনয়ের সাথে প্রয়োজনানুপাতে মানবসমাজে মেলামেশা কর।

---বিনয়কে তোমার চরিত্রের ভুষণ বানাও এবং কারো কাছে অভিযোগ পেশ করো না।

---কথাবার্তায় নম্রতা অবলম্বন কর। চুপচাপ থাক এবং নির্জনে থাক।

---মনপ্রাণ দিয়ে নিজ কাজকর্মে লেগে থাক।

---অন্তরে অস্থিরতা আসতে দিও না এবং সকল ক্রিয়াকলাপ আল্লাহর হুকুমে হয় এই ধারণা রাখ।

---সাহসিকতার সাথে নিজ অন্তরে গাইরুল্লাহর ভয়ভীতির অনুপ্রবেশে বাধা দাও।

---ধর্মীয় কাজে অন্যের খেদমত করার অভ্যাস কর।

---প্রথমে নিয়ত শুদ্ধ কর, অতঃপর কাজে প্রবৃত্ত হও।

---খাদ্য গ্রহণ কর মধ্যমপন্থায়; এত বেশী খেয়ো না যে অলসতা আসে, এত কমও খেয়ো না যে দূর্বল হয়ে কাজকর্ম নষ্ট হয়।

---সকল বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর।

---জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজকর্ম করা উত্তম। জীবিকার জন্যে আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকাও অনুমোদিত, তবে সেক্ষেত্রে সৃষ্টির কাছ থেকে আশা করা থেকে নিরাপদ হতে হবে।

---আল্লাহ ছাড়া সকল কিছু থেকে অন্তর পবিত্র রাখ। আল্লাহ ছাড়া অন্যের ভয় বা অন্যের কাছ থেকে পাবার আশা পরিত্যাগ কর।

---আল্লাহকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হও, নিরবচ্ছিন্নভাবে তাকে চাও।

---সদা সর্বদা আল্লাহর সঙ্গে থাক।

---আল্লাহ যা কিছুই দেন, ছোট কিংবা বড়, তাতে কৃতজ্ঞ হও।

---দারিদ্রে হতাশ হয়ো না বরং তোমার দারিদ্রকে সম্মানের চোখে দেখ, কেননা আল্লাহ তোমায় যা দিয়েছেন তা নবী ও ওলীদের দিয়ে থাকেন।

---সহকর্মীদের সাথে নম্রতা ও দয়া দেখাও। তাদের দোষক্রটি মার্জনা কর এবং তাদের ওজর আপত্তি গ্রহণ কর।

---সর্বদা গীবত থেকে বেঁচে থাক।

---নিজেরটা ছাড়া অন্যের ভুলক্রটির দিকে মনোযোগ দিও না।

---সকলকে নিজের চেয়ে বড় জান, কারো সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ করো না যদিও তুমি সত্যের উপর থাক।

---খাদেম হও অন্যের খেদমত কর।

---দরিদ্র ও অভাবীদের সঙ্গী হও এবং আলেম-ওলীদের খেদমত কর ভদ্রতা ও সম্মানের সাথে।

---বস্তুর অস্তিত্ব ও অনস্থিত্ব উভয়কে সমান ভাব।

---যতটুকু সম্পদ তোমার আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাক।

---নিজের চেয়ে অন্যকে অগ্রাধিকার দাও।

---ক্ষুধা-পিপাসাকে ভালোবাস কেননা এ হলো আল্লাহর খাদ্য।

---কম হাস, বেশী কাঁদ। আল্লাহর শাস্তি ও অবহেলাকে ভয় কর।

---মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর, কারণ তা আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের সাথে বন্ধন কেটে দেয়।

---জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, কারণ এটি আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা। জান্নাত কামনা কর, এটি আল্লাহর নৈকট্য।

---প্রতিদিন বাদ ফজর ও বাদ মাগরিব সারাদিনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে নিজের কাজের হিসাব লও। উত্তম কর্মের জন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর এবং মন্দকর্মের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।

---সত্যবাদিতা ও হালাল খাবার গ্রহণকে নিজের স্বভাবে পরিণত কর।

---আনন্দ স্ফুর্তি ও হারাম ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্যে যত লোকসমাবেশ হয় সেসব থেকে দূরে থাক।

---জাহেলিয়াতের সকল রুসুম-রেওয়াজ পরিহার কর।

---ভালোবাসা, ঘৃণা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা পোষণ কর কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে।

---কারো ক্ষতি করো না এবং কারো কাছ থেকে কোন কিছুর আশা করো না।

---চিরকালের জন্যে মধ্যপন্থী হও এবং অপব্যয় ত্যাগ কর।

---অত্যধিক দুঃশ্চিন্তা পরিহার কর এবং সংশোধনমূলক মনোভাব নিয়ে থাক।

---প্রভুর বাধ্য হও, নেক হও এবং গাম্ভীর্য্য অবলম্বন কর।

---উপরোল্লিখিত সবই নেককারদের স্বভাব। যদি তেমনটি তোমারও নসীব হয় তবে তার জন্যে গর্ব করো না এবং নিজেকে উত্তম মনে করো না।

---সাধারণ মুসলমান ও নেককারদের কবর জিয়ারত কর। তাদের উদ্দেশ্যে দোয়াদরূদ পড়ে ইছালে সওয়াব কর।

---ভদ্রতা এখতিয়ার কর এবং নিজ মুর্শিদকে মেনে চল, কেননা তিনি নবীর (সাঃ) প্রতিনিধি।

---সর্বদা নিজ তরীকার মাশায়েখদের জন্যে দোয়া কর, কেননা তারা ছিলেন তোমার আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম।

আল্লাহতায়ালা আমাদের ক্ষমা করে দিন ও দুনিয়া আখেরাতের কামিয়াবি দান করুন।।